সার্ধশতবর্ষে দীনেশচন্দ্র সেন ও ভগিনী নিবেদিতা : একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুমনা সাহা

সদ্য সমাপ্ত হয়েছে প্রখ্যাত গবেষক-সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের সার্ধশতবর্ষ। এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষের সূচনালগ্নে। এই শুভ অবসরে এই দুই মনীষীর মধুর সম্পর্কের লিপিচিত্র অঙ্কন এবং দীনেশচন্দ্র সেনের কার্যাবলির একটি দিগ্‌দর্শন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাড়ির সামনে চড়ক-মেলার বিশাল মাঠ। সেই মাঠে বছর দশেকের দুই বালকের কথোপকথন :

দীনেশ—তুই বড় হয়ে কী হতে চাস?

অবিনাশ—আমি জমিদার হব, হাজার লোক আমার পিছু পিছু ঘুরবে। আর তুই কী হবি?

দীনেশ—আমি কবি হব, নয়তো সাহিত্যিক। কুঁড়েঘরেও যদি থাকি, মস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষ আমার সেই কুঁড়ের দুয়ারে এসে মাথা নোয়াবেন।[১]

এই বালক দীনেশই ভবিষ্যতের রায়বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন। জীবনে নানা উত্থানপতন পেরিয়ে তিনি রচনা করেছেন প্রায় ষাটখানি গ্রন্থ। তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল 'লিরিকাল প্রোজ স্টাইল'।[২] তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক, কাব্যিক গদ্যস্রষ্টা, গ্রামবাংলার গীতিকাব্যের সংগ্রাহক ও সংরক্ষক। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, রামায়ণী কথা, বেহুলা, সতী, ফুল্লরা, সরল বাংলা সাহিত্য, বৈদিক ভারত (বেদ থেকে সংগৃহীত ছোট গল্পের সংকলন), ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ), পৌরাণিকী (পুরাণের গল্প সংকলন), বৃহৎ বঙ্গ, ময়মনসিংহ গীতিকাব্য (সম্পাদনা)। এছাড়াও বহু গ্রন্থ তিনি পৃথক ও যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : History of Bengali Language and Literature, The Vaishnava Literature Mediaeval Bengal, The Folk Literature of Bengal, Chaitanya and His Age, Eastern Bengal Ballads (4 Volumes) প্রভৃতি।

'ময়মনসিংহের গীতিকাব্য' প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত হয়ে দীনেশচন্দ্রকে লেখেন : ''বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ উৎসারিত

উৎস; অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসবৃষ্টি আর কখনও হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্য আপনি ধন্য।"[৩]

গ্রামবাংলার এই প্রাণের ধন আবিষ্কারের জন্য দীনেশচন্দ্র বছরের পর বছর নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা না করে, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে, বিশেষত ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও গাছতলায়, কখনও মন্দিরে, কখনও কোনও কৃষকের গৃহে, আক্ষরিক অর্থে 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে' নীতি অনুসরণ করে সেইসমস্ত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এমনই ছিল তাঁর নাড়ির টান! সমকালীন কবি জসীমুদ্দিনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রকাশিত হওয়ার পর এক সাহিত্যবাসরে দীনেশচন্দ্র বলেন : ''আমি হিন্দু। আমার কাছে বেদ পবিত্র, ভাগবত পবিত্র, কিন্তু 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' পুস্তকখানি তাহার চাইতেও পবিত্র। কারণ ইহাতে আমার বাংলাদেশের মাটির মানুষগুলির কাহিনি আছে।"[৪]

বিশেষ করে যে-কারণে আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে সাহিত্যক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের অবদান অমর হয়ে থাকবে, তা হল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস।' এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি এক-এক দিন প্রায় পনেরো-কুড়ি মাইল পায়ে হেঁটেছেন—প্রাচীন পুঁথির হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সন্ধানে। উপাদানের অপ্রতুলতা যেমন ছিল, অর্থেরও অভাব ছিল। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ১৮৯০ সালে এবং গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালের ২ ডিসেম্বর। প্রায় ছয় বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় হয়েছিল, ফলে কয়েকবছর তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়। তাঁর পূর্বে এই ধরনের গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ অনেকেই, কিন্তু দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ছিল তথ্যের প্রাচুর্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিক সুসংবদ্ধ যুগবিভাগ, এবং বঙ্গবাসীর মনের অন্দরমহল সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সঞ্জাত দৃষ্টিকোণ।[৫] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁকে বঙ্গসাহিত্যের জগতে সাদরে বরণ করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পরিশ্রমের ফসলকে 'বাংলার শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ সুবিশাল ইতিহাস বনস্পতির ছায়া'[৬] নামে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার। একটি দুরূহ কাজ সদ্য শেষ করেছেন—ইংরেজি ভাষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা। গ্রন্থটির ভাষা আগাগোড়া দেখে সংশোধন করে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে তিনি এলেন বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতার কাছে।

দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর মানুষ—রুচি ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে। কিন্তু উভয়ের সখ্যে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নিবেদিতার সময়াভাবের কথা ভেবে বিনয়মিশ্রিত সংকোচের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন, ''পুস্তকখানি খুব বড়", কিন্তু নিবেদিতার দৃঢ় উত্তর ছিল : ''তা হোক না, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।"[৭] এই শুরু হল নিবেদিতার কাছে দীনেশবাবুর যাতায়াত।

অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিবেদিতা পড়তে শুরু করলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস।' ইংরেজি 'ইডিয়ম' সংক্রান্ত ভুল কিছু কিছু বের হত, কিন্তু নিবেদিতা দীনেশবাবুর ইংরেজি ভাষার বাঁধুনির প্রশংসাই করতেন। ভাবের দিক থেকে সর্বদাই তর্কবিতর্ক চলত, নিবেদিতার মনে যে-বিষয়ে খটকা লাগত, সেক্ষেত্রে তিনি কিছুতেই দীনেশবাবুর সঙ্গে সহমত হতে পারতেন না। হিন্দুসমাজের কিছু

রীতিনীতি নিবেদিতার কাছে অদ্ভুত মনে হত। লহনা ও খুল্লনার গল্পে ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী খুল্লনাকে ছাগল চরাতে বনে পাঠানো হয়েছিল। বিনা অপরাধে জ্ঞাতিরা তার হাতে খাবে না বলে ঘোঁট পাকাল। তাদের দাবি—হয় বিষ খেয়ে, নয়তো অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তাকে চরিত্রের শুদ্ধতার প্রমাণ দিতে হবে। আর তা না হলে, এক লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে ধনপতি তাকে ঘরে তুলুন। অন্যথায় তারা ধনপতিকে সমাজচ্যুত করার ভয় দেখাতে লাগল। নিবেদিতা জেদ ধরে বসলেন যে, ওই অংশ বাদ দিতেই হবে। তাঁর মতে, ''জোর করে তার সতীন তাকে ছাগল চরাতে বনে পাঠিয়ে তার উপর জুলুম করল, তাকে ঢেঁকিশালে শুতে দিল, আধপেটা খাইয়ে চরম কষ্ট দিল। সমাজের বিচারপতিরা এর জন্য লহনাকে কোনও শাস্তি না দিয়ে নিপীড়িত, নিরপরাধ খুল্লনার উপর উলটো শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। এ কেমন সমাজ? আপনার গল্পে যদি এই সমস্ত কথা থাকে, তবে পৃথিবীর লোক একে 'কাজির বিচার' বলে আপনাদের ঠাট্টা করবে—নো, নো, নো—একথা আপনি রাখতে পারেন না, গল্প থেকে এই অংশটি ছেঁটে ফেলুন।''

দীনেশচন্দ্র পড়লেন মহা সংকটে! তিনি বললেন, ''আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের চরিত্র-মর্যাদার আদর্শ অন্যরূপ—সে মাপকাঠি বাতাসে নড়ে, তা আপনাদের common sense দিয়া বুঝিতে পারিবেন না... আমাদের সামাজিক বিধানে স্ত্রীলোক দেবীর ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন, সেই দেবতা সর্বপ্রকারে কলঙ্ক ও গ্লানির উপরে থাকিবেন...। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না... এদেশের কাব্য, জীবন ও সমাজ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবনামূলক, সেই ভাবের যাদুকাঠি হাতে না থাকিলে এই সমাজের মন্দিরে আরতি দেখিবার প্রবেশাধিকার হইবে না।''[৮]

এইভাবে কোনও একটা বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু হলে দিনদুয়েক তর্কযুদ্ধেই হয়তো কেটে যেত, বইয়ের এক পঙ্‌ক্তিও পড়া হত না। অনেক সময় নিবেদিতা জেদ ধরতেন, কোনও একটি বিশেষ অংশ বাদ না দিলে তিনি আর বই পড়বেন না। অগত্যা বাধ্য হয়ে দীনেশবাবুকে খানিকটা পরিবর্তন করতে হত। নিজের ভাবের সঙ্গে না মিললে নিবেদিতা এক পাও এগোতে পারতেন না, গ্রন্থের সমালোচনার ভার বহন করা গ্রন্থকারের দায়, তাঁর কাজ শুধু ইংরেজি সংশোধনের—একথা তিনি মনে রাখতেন না। কারণ কোনও একটি বিষয়ের ভার নিলে তিনি সেটিকে পরের বলে মনে করতেন না, সম্পূর্ণ নিজের ভেবে তার জন্য পরিশ্রম করতেন। মূল্য দিয়ে এই পরিশ্রমের দাম শোধ করা যায় না। কোনও কোনও দিন সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাঁরা বইটি নিয়ে পড়ে থাকতেন, মাঝে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য সামান্য আহার করে নিতেন। দীনেশচন্দ্র উত্তরকালে নিবেদিতার এই আত্মবিস্মৃত কাজের কথা স্মরণ করে লিখেছেন : ''এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপরভাববিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম।''[৯] কাজেই ভাষা সংশোধনের কাজ অল্পই হত, যা হত তা বেশির ভাগই ভাব সংশোধন।

নিবেদিতার কবিতা হৃদয়ঙ্গমের শক্তি ছিল অসামান্য। শিব সম্বন্ধে শূন্যপুরাণের একটি ছড়া দীনেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছিলেন। তার ভাবটি এইরকম—''শিব, তুমি কেন ভিক্ষার মতো হীনবৃত্তি গ্রহণ করেছ? কোনওদিন কিছু জোটে, কোনওদিন রিক্ত হাতে ফিরে আসো। যদি তুমি চাষ করে ধান বোনো, তাহলে তোমার এই কষ্ট দূর হবে। হে প্রভু, তুমি উলঙ্গ হয়ে অথবা বাঘছাল পরে ঘুরে বেড়াও, যদি কাপাস বুনে তুলো তৈরি

কর, তবে কাপড় পরতে পারতে!" এই অংশটি পড়ে নিবেদিতা শিশুর মতো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বারংবার বলতে লাগলেন, ''আশ্চর্য! আশ্চর্য!" ''সিস্টার, এর মধ্যে এমন কি পেলেন যে দীনদরিদ্র রাজ্য পেলে যেমন আহ্লাদিত হয়, আপনি সেইরকম করছেন?"—দীনেশবাবুর এই সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরেও নিবেদিতা কবিতা থেকে চোখ না সরিয়ে কেবল বলতে লাগলেন, ''ও দীনেশবাবু, এটা একটা আশ্চর্য জিনিস!" পরদিন ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছে দীনেশবাবু এর উত্তর পেলেন : ''সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁদের দেবতার কাছে সাহায্য চেয়ে ধন, যশ, মান, স্বাস্থ্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ওই কবিতায় ভক্ত তাঁর উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছেন। নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নেই। ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলে গেছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয়, তাই তাঁর ভাবনার লক্ষ্য হয়েছে।"[১০]

গ্রাম্য ছড়া সম্বন্ধে দীনেশবাবুর অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেলে তাঁকে নিবেদিতার গালমন্দ সইতে হত, কারণ নিবেদিতার মতে ওই সমস্ত পল্লিগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে মহাকবিদের রচিত কাব্যের তুলনায় বেশি গভীরতা আছে, আভিধানিক জ্ঞান না থাকলেও প্রাণ আছে, কুঁড়েঘরে সোনারুপোর থাম না থাকলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকার গাছ আছে। বইটি পড়তে পড়তে কখনও দীনেশবাবুর প্রতি বর্ষিত হত গালাগালির বৃষ্টি, কখনও ছুটত প্রশংসার তুফান। কোনও অংশ পাঠ করে নিবেদিতা বলতেন, ''দীনেশবাবু, আপনার মতো বোকা আমি জগতে আর একটিও দেখিনি," আবার অন্য কোনও অংশ পড়ে বলে উঠতেন, ''আপনিও সত্যিই একজন কবি, আপনার লেখা গদ্য হলে কি হবে, ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব!" দীনেশবাবু নিবেদিতার 'রুষ্ট কথার মধ্য দিয়া তাঁহার অতি কোমল পুষ্পকোরকের মতো সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি' দেখতে পেতেন। একবার এক ইংরেজ বন্ধু সাক্ষাৎ করতে এলে তাঁকে সম্মুখে উপবিষ্ট দীনেশচন্দ্রের পরিচয় দিয়ে নিবেদিতা বলেন, ''ছেঁড়া পুঁথিপত্রের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ত্ব ও ইতিহাস—কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত—ইনি যতটা জানেন, সে-বিষয়ে এঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[১১]

মিঠেকড়া সম্পর্কের দু-চার ঝলক

নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রকে প্রায়ই 'কাপুরুষ' বলে ঠাট্টা করতেন, বলতেন, ''দীনেশবাবু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সেদিক দিয়ে ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নয়, মর্মপীড়া দান করে। কিন্তু তবুও আপনাকে ভাল লাগে কেন জানেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন, দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রকৃত দেশভক্তের স্থান দাবি করার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে আমার ভাল লাগে।"[১২]

একদিন দীনেশবাবু প্রকৃতই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে লজ্জিত হয়েছিলেন। এক সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী গণেন, নিবেদিতা ও দীনেশবাবু গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলেন। দীনেশবাবু আগে, তারপর নিবেদিতা এবং শেষে গণেন চলেছেন। এমন সময় হঠাৎ এক খেপা ষাঁড় শিং নাড়তে নাড়তে তাঁদের দিকে ছুটে এল। দীনেশবাবু প্রাণভয়ে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। ফলে নিবেদিতা ষাঁড়ের সামনে পড়ে গেলেন। গণেন তাড়াতাড়ি এসে ষাঁড়টিকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনজন আবার একত্র হলে নিবেদিতা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে হাসতে হাসতে বললেন, ''আপনি আজ পুরুষজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একটি অসহায় রমণীকে ষাঁড়ের সামনে ফেলে নিজের জীবন রক্ষা করেছেন;

আজকের এই কাজটি আপনার কীর্তিস্তম্ভ হয়ে রইল।" তারপর তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, ঝাঁঝালো সুরে বললেন, ''দীনেশবাবু, আপনার একটু লজ্জা হল না?"[১৩] দীনেশচন্দ্রও বুঝেছিলেন, কাজটা ভাল হয়নি। তাই অন্যসময় যেমন কথা কাটাকাটি করেন, তা না করে চুপ করে রইলেন।

নিবেদিতা রাস্তায় চলার সময় সাহেবদের গ্রাহ্য করতেন না, কিন্তু বাঙালিদের খুব সম্মান দেখাতেন। একদিন তাঁরা ট্রামে ভ্রমণ করছিলেন। একজন ইংরেজ এসে নিবেদিতার গা ঘেঁষে বসাতে নিবেদিতা এমন তীব্রভাবে চোখ রাঙিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন যে সাহেব অন্য বেঞ্চে পালিয়ে বাঁচলেন। নিবেদিতা দীনেশবাবুর দিকে আরও একটু সরে এসে হাসিমুখে গল্প করতে লাগলেন।

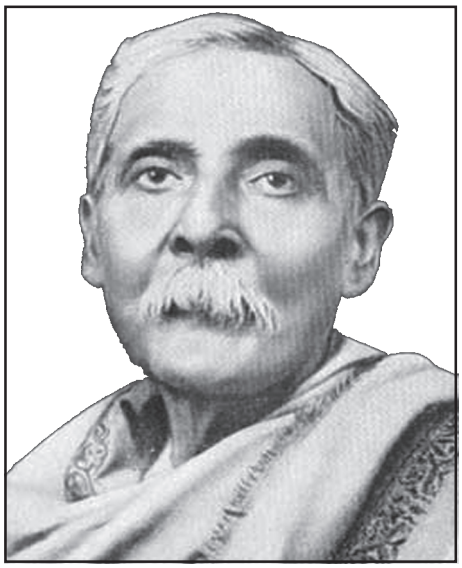

দীনেশচন্দ্র সেন

নিবেদিতার শিল্পপ্রীতি ছিল অতুলনীয়। একদিন বাগবাজারের ঘাটে এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিনি অসীম আগ্রহ সহকারে তিনটি মাটির পুতুল কিনলেন। অতি সাধারণ মাটির পুতুল—সেগুলোর না আছে কোনও সৌষ্ঠব, না কোনও বিশেষ ব্যঞ্জনা। কালো রং করা, মাথায় খোঁপা, জগন্নাথের হাতের মতো দুটি অসমাপ্ত হাত, পা দুটি শিবলিঙ্গের মতো বা বেতের মোড়ার মতো। এমন পুতুল কলকাতার অলিতে গলিতে সর্বত্র পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশে এমন শিশু নেই যারা শৈশবে এমন দশ-বিশটা পুতুল ভাঙেনি। কিন্তু নিবেদিতা যে সেগুলোর মধ্যে কী পেলেন, কে জানে! ''অতি আশ্চর্য! অতি অদ্ভুত সুন্দর!" এইরকম উচ্চ প্রশংসা করে এক পয়সার জিনিস এক টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। দীনেশচন্দ্র অনেকবার প্রশ্ন করলেন, ''এগুলোর ভিতর আপনি এমন কী পেলেন যে একেবারে খেপে গেলেন?" নিবেদিতা তখন পুতুল নিয়ে বিভোর, দীনেশবাবুর কথায় কর্ণপাত করলেন না। পরদিনও দীনেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''পুতুলগুলো নিয়ে কাল অমন করছিলেন কেন?" নিবেদিতা লুব্ধ চোখে একটি পুতুল হাতে করে দেখতে দেখতে বললেন, ''ও আপনি বুঝবেন না! ওর মতো সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস আমি ভারতবর্ষে দেখিনি!" দিন তিনেক পরে, তিনি নিজেই হাসিমুখে দীনেশবাবুকে বললেন, ''৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কতকগুলো জিনিস সম্প্রতি ক্রিট দ্বীপ থেকে ড. ইভান্স আবিষ্কার করে বিলেতে নিয়ে এসেছেন। আমি এবার বিলেতে গিয়ে সেগুলো দেখে এসেছি। সেই সংগ্রহের ভিতরে অবিকল এইরকম পুতুল দেখেছি।"[১৪] এইবার নিবেদিতার আহ্লাদের কারণটি পরিষ্কার হল।

নিবেদিতা কালীভক্ত ছিলেন, কালীমন্দির দেখলেই প্রণাম করতেন। কিন্তু একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি দীনেশবাবুকে একটি একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলেছিলেন : ''আপনি কি ভগবানকে সত্যই 'মা' বলে ডাকতে পারেন?" দীনেশবাবু অবাক হয়ে বললেন, ''কেন পারব না? তিনি যে 'মা', এ আমাদের মুখের কথা নয়। মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে আমরা ভগবানের মাতৃত্ব উপলব্ধি করে বড় হয়েছি।

কালীমন্দিরে গিয়ে যখন 'মা' 'মা' বলে প্রণাম করি, তখন আমরা কপটতার অভিনয় করি না।" নিবেদিতা বললেন, ''দেখুন, এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের তফাত, আমি কিছুতেই মনে মনে ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করতে পারি না। তাঁর পিতৃত্বই আমাদের চিরাগত সংস্কার।"[১৫]

ঐতিহাসিক খড়দহ ভ্রমণ

একদিন কথাপ্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র নিবেদিতাকে চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দহ এলাকার বারোশো নেড়া ও এক হাজার নেড়ির নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্রের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনি শোনালেন। সেইদিন থেকেই নিবেদিতা তাঁকে খড়দহে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাগ্রহ তাগাদা দিতে লাগলেন। ফাল্গুন মাসের এক মধ্যাহ্নে নিবেদিতা, ব্রহ্মচারী গণেন ও দীনেশবাবু নৌকাযোগে রওনা হলেন খড়দহের উদ্দেশে। ওই নেড়া-নেড়িরা ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী। বঙ্গদেশ থেকে যখন বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, তখন বীরভদ্র তাঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে আশ্রয় দান করেন। যে-স্থানে বীরভদ্র তাঁদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, কৃতজ্ঞতার স্মারক-স্বরূপ সেই স্থানে একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছিল এবং ওই মেলা প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হত। যখন নিবেদিতা খড়দহ ভ্রমণে যান, তার কয়েক বছর আগে থেকে মেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। নৌকায় বসে নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রকে বলেন, ''আমি সে জায়গার কি নাম দিয়েছি জানেন? ওটা হল বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সমাধিক্ষেত্র। ওঁরা মেলাটা তুলে দিলেন কেন? এমন একটি ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনার স্মারক উৎসবটাকে এইভাবে মাটি করে ফেলতে হয়?''

বেলা তিনটের সময় একজন মেমসাহেব ও দুজন বাঙালি ভদ্রলোককে ঘাটে নামতে দেখে পল্লিবাসী জনতা প্রায় পঙ্গপালের মতো তাঁদের পিছু নিল। নিবেদিতা আত্মপরিচয় দিতে চাননি। নিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত শ্যামসুন্দর মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ধাপের উপর নিজের 'হ্যাট' খুলে রেখে তিনি যখন ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, সমবেত জনতার মুগ্ধতা ও কৌতূহল আর বাঁধ মানল না। যখন তারা জানল, ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা, তখন কেউ অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল, কেউ বা ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁকে জোড়হাতে প্রণাম নিবেদন করল। তাঁর অনুরোধে নিত্যানন্দের স্বহস্তলিখিত ভাগবত ও তাঁর ব্যবহৃত ভাঙা লাঠিটি এনে পূজারি দেখালেন। নিবেদিতা সেই পুঁথি ও যষ্টির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিলেন। পুরোহিত একটি রক্তবর্ণের 'শিরোপা' এনে নিবেদিতাকে ধারণ করতে বললেন। জানালেন, সেটি অতি পবিত্র ও দুর্লভ; কেবল রাজা-রাজড়াগণই তা মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন। নিবেদিতা সেটি মস্তকে ধারণ করলে উপস্থিত জনতা আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠল। এরপর নিবেদিতা সবিনয়ে বিদায় চাইলে পুরোহিত বললেন, ''সেও কি হয়? প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে।" এই বলে তিনি এক ঠোঙা রসগোল্লা নিয়ে এলেন। দীনেশবাবু ও গণেন পেটভরে রসগোল্লা খেলেন, নিবেদিতা মাত্র একটি গ্রহণ করলে সকলের অনুরোধে তাঁকে আরও একটি খেতেই হল। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বেলাশেষে তাঁরা মেলার স্থানটি দর্শন করলেন। নিবেদিতা অনেকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই মেলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য 'নোট' করে নিলেন। তিনি দীনেশবাবুকে বলেছিলেন, দীনেশবাবু যদি কোনওদিন বৌদ্ধধর্মের সমাধিক্ষেত্র দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন, তখন নিবেদিতা তাঁকে সেই নোট ব্যবহার করতে দেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।[১৬]

সেই নোট বর্তমানে 'The Complete Works

of Sister Nivedita' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তার সারাংশ এইরকম :

''চারদিক শান্ত, নির্জন। আমরা ইঁট বাঁধানো এক প্রাচীন মনোরম ঘাটে নামলাম। ঘাটের উপর দুদিকেই কারুকার্যময় অট্টালিকা। তখন বর্ষাকাল। গঙ্গাতীরের শোভা দর্শনের এই হল সেরা সময়। নদী কানায় কানায় জলে পূর্ণ। দুই তীরের গাছের ঘন সবুজ পাতার অসাধারণ সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে গেল। খড়দহের নিস্তব্ধ গলির ভিতর দিয়ে চলেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নগরীর কলেজ-বিল্ডিং-এর মতো আদল দুইপাশের বাড়িগুলির। তাদের গঠনসৌষ্ঠব নিখুঁত এবং তাতে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। ভাবছিলাম, এরাই নিত্যানন্দের বংশধর! সেকথা হয়তো এত বছরের ব্যবধানে তারা ভুলেই গিয়েছে। এতদিনে তারা নির্ঘাত রক্ষণশীল সমাজের গোঁড়ামির কঠিন খোলসের মধ্যে নিজেদের বন্দি করে ফেলেছে!...

''এইসমস্ত ভাবতে ভাবতে শ্যামসুন্দর মন্দিরে ওঠবার ইঁটের সিঁড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘোরানো সিঁড়িগুলোর সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম এবং ওই প্রবেশদ্বার থেকেই যতটা সম্ভব বিগ্রহদর্শনের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় ভিতর থেকে পূজারি ব্রাহ্মণ বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি নাটমন্দিরে উঠে আসুন, এখান থেকে আরও ভালভাবে দর্শন করতে পারবেন।' তাঁর উষ্ণ আমন্ত্রণে আপ্লুত হয়ে আমি নাটমন্দিরে উঠে এলাম।...

''নিত্যানন্দের বসতবাটির সামনের আঙিনায় যেখানে নেড়া-নেড়িদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করা হয়, পবিত্র স্মৃতিচিহ্নরূপে স্থানটি এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। তৃণাচ্ছাদিত গৃহ-প্রাঙ্গণ বারান্দার আকারে সিমেন্ট বাঁধাই করে দেওয়া হয়েছে। যে-স্থানে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের জন্ম, সেই স্থান তুলসীকানন দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। আমি কল্পনার চোখে দেখলাম, দরজার সামনে নিত্যানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কাছে প্রায় আড়াই হাজার বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ি এসেছেন, নিজেদের দুঃখদুর্দশার কথা জানাচ্ছেন এবং নিত্যানন্দের বিধান মাথা পেতে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।...

''আর নিত্যানন্দের স্বহস্তলিখিত পুঁথিটি যেন একটি ছবি! কাঠকয়লার কালি দিয়ে লেখা তালপাতার পুঁথি—সেখানে লেখা প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শূন্যস্থান, প্রতিটি শব্দ নিখুঁত! তা যেন নিত্যানন্দের হৃদয়—মুক্ত, মধুর, আনন্দে উদ্ভাসিত! আমাদের সামনে উন্মুক্ত সেই হৃদয়। অপর যে-স্মৃতিচিহ্নটি দেখলাম, তার কথা মুখে উচ্চারণ করা নিষেধ, অতি গোপনে, সন্তর্পণে অনুচ্চারিত স্বরে সেকথা বলা হল। যখন নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্য সংসারে ফিরে গিয়ে গৃহিজীবন যাপন করার আদেশ দিলেন, তাঁর সন্ন্যাসদণ্ডটি ভেঙে ফেললেন নিত্যানন্দ... না, চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর এ-বিচ্ছেদ কোনও শাস্তি নয়, বা উচ্চ আদর্শ থেকে পতিত হওয়া নয়—এ হল এক মহৎ কর্তব্য সাধনের উদ্দেশ্যে চরম আজ্ঞাবহতা। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ও অক্রোধের প্রতিমূর্তি নিত্যানন্দ শান্তভাবে পাদচারণা করেছেন এই খড়দহ গ্রামে, দেখিয়েছেন আদর্শ গৃহীর জীবন। খড়দহের এই মন্দিরে সেই ভগ্ন যষ্টির কেবল মাথার অংশটি রক্ষিত আছে। নিত্যানন্দ যে-দণ্ড ধারণ করে চৈতন্যের সঙ্গে প্রায় তিন বছর বাংলার গ্রামেগঞ্জে পরিক্রমা করেছেন আর আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করেছেন—তাঁর স্পর্শপূত সেই দণ্ড পূজারি আমাদের সামনে ধরলেন। অতি সাদামাটা একটি ভাঙা কাঠের টুকরো—আমি লুব্ধভাবে সেটির দিকে তাকালাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, যেন স্বপ্ন দেখছি! কিন্তু হায়! নিত্যানন্দ যা দর্শন করেছেন, তা যদি আমরা দেখতে পেতাম! তিনি যাঁকে স্পর্শ করেছেন, তাঁর পরশ যদি আমরা পেতাম!"

শেষের দিনগুলি

শেষবারের মতো দার্জিলিং যাওয়ার দুমাস আগে নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রের কাছ থেকে একটি পাথরের 'প্রজ্ঞাপারমিতা' মূর্তি চেয়ে নিয়েছিলেন। মূর্তিটি অশুভ—এমন একটি বিশ্বাস থেকে দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন, ''এ মূর্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করছি—আপনি এটি না নেন, এই আমার ইচ্ছা!'' নিবেদিতা তাতে বললেন, ''আপনার মতো ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।'' একরকম জোর করেই তিনি সেই মূর্তি নিলেন এবং সেটির পিছনের অংশ একটি কুলুঙ্গির সঙ্গে গেঁথে অতি যত্নে ধূপদীপ দিয়ে প্রত্যহ তাঁর সেবা করতেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পর ক্রিস্টিন ভীতকণ্ঠে দীনেশবাবুকে বলেছিলেন, ''এই মূর্তি এখন আপনি নিয়ে যান, আমাকে রক্ষা করুন। যেদিন থেকে এই মূর্তি এঘরে এসেছে, সেইদিন থেকে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটেছে তা আর কি বলব? মৃত্যু এসে তাঁকে শান্তি দিয়েছে মাত্র।''[১৭] দীনেশচন্দ্র তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, ওই মূর্তি নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে দিয়ে গিয়েছেন, তাই সেটি তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তাঁরাও সেটি গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হননি। অগত্যা বাধ্য হয়ে দীনেশচন্দ্রকে ওই মূর্তি অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

নিবেদিতার দার্জিলিং যাত্রার কয়েকদিন আগে দীনেশচন্দ্রের ইংরেজিতে লিখিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হলে তিনি দুটি গ্রন্থ নিবেদিতার হাতে এনে দিলেন। নিবেদিতা বিশেষভাবে দীনেশবাবুকে বলে রেখেছিলেন যেন ভূমিকায় তাঁর নামের উল্লেখ না থাকে। গ্রন্থটি হাতে পেয়ে তিনি কতভাবে যে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, সেকথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন দীনেশচন্দ্র। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'-তে লিখেছেন : ''তাঁর শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'এই বই উপলক্ষে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, দুইজনে একত্র হইয়া খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর বোধহয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙিবেন না, আপনি যদি পূর্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করিব।' বস্তুত তাঁহার ভগিনীজনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব! যেদিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।''✠

তথ্যসূত্র

১। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য* (জিজ্ঞাসা : কলকাতা, ১৯৬৯), পৃঃ ৭৬

২। দ্রঃ Narayan Chaudhuri, *Makers of Indian Literature : Dinesh Chandra Sen*, (Sahitya Academi, 1990)

৩। দ্রঃ www.Jasimuddin.org

৪। দ্রঃ তদেব, *জসীমুদ্দিনের স্মৃতিকথা*

৫। Srikanta Roy Chowdhury, *Contribution of Dinesh Chandra Sen in Bengal Historiography* (গবেষণাপত্র, সৌজন্য : ইন্টারনেট)

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বঙ্গদর্শন (ভূমিকা)*

৭। *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, পৃঃ ২০৬

৮। তদেব, পৃঃ ২০৭ ৯। তদেব, পৃঃ ২০৮

১০। তদেব, পৃঃ ২০৮-২০৯

১১। তদেব, পৃঃ ২০৯ ১২। তদেব, পৃঃ ২১০

১৩। তদেব ১৪। তদেব, পৃঃ ২১৩

১৫। তদেব, পৃঃ ২১৪

১৬। তদেব, পৃঃ ২১১-২১৩

১৭। তদেব, পৃঃ ২১৪-১৫